পঞ্চম অধ্যায়

কাহিনীমূলক কবিতায় বিধৃত রবীন্দ্র-কবিমানসের পরিচয়

পঞ্চম অধ্যায়

কাহিনীমূলক কবিতায় বিধৃত রবীন্দ্র-কবিমানসের পরিচয়

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের কালানুক্রমিক মানস-বিবর্তনের ধারাটি পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, কবির রচিত লিরিক বা সমতুল্য কবিতাগুলিতে তাঁর আত্মগত অনুভূতি সক্রিয় থেকেছে। পাশাপাশি কবি যখন কাহিনীমূলক কবিতা লিখেছেন সেখানে এক স্বতন্ত্র কবিমানসের স্ফূরণ ঘটেছে। যে কোনো সাহিত্য-মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে রচয়িতার মানসধর্মটি। রবীন্দ্রকাব্যও তার ব্যতিক্রম নয়। কবির বিভিন্ন সময়ে রচিত কাহিনীমূলক কবিতাগুলি পাঠ করলে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, সে সব কবিতা কবি হঠাৎ লেখেননি, এর গভীরে প্রোথিত ছিল কবিমানসের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও ভাবনা। আবার একথাও ঠিক যে, কাহিনীমূলক কবিতাগুলির সৃষ্টি যেমন হঠাৎ এক দিনেই হয়নি, তেমনি কবির সমগ্র কাব্যজীবনেও লক্ষ্য করা যায় কাহিনীমূলক কবিতা রচনার ঢেউ কোনো সময় এসেছে বাধাবন্ধহীন ভাবে আবার কোনো সময় তাঁর সেই প্রচেষ্টাটি ছিল একেবারেই স্তব্ধ। কবি যেন কাহিনীমূলক কবিতা সৃষ্টি সম্পর্কে একেবারেই মৌন ও নিরাসক্ত থেকেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে সে সময় কবির কোন মানসধর্মটি সক্রিয় ছিল যা কাহিনীকবিতা রচনার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে অথবা কেনই বা কবি সেই মৌনতার পর আবার কবিতায় কাহিনী পরিবেশন করতে শুরু করলেন? এর সমাধান পেতে হলে কবির রচিত পূর্বাপর সমস্ত কাব্যগুলিতে প্রকাশিত কবির মননধর্মটি আলোচনা জরুরি। বর্তমান অধ্যায়ের অভিষ্ট হবে কালানুক্রমিকভাবে কবির মানসধর্মের বিবর্তনটির পর্যালোচনা করা এবং কাহিনীমূলক কবিতাগুলি রচনার প্রেক্ষাপটে কবির কোন্ মানসধর্মটি সক্রিয় থেকেছে তার সন্ধান করা।

যে কোনো কবির কাব্যরচনার পেছনে তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পরিবেশটির যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তা বলার অবকাশ রাখে না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। যে পরিবার ও পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বর্ধিত ও লালিত হয়েছিলেন তার প্রভাব কবির কাব্যসৃষ্টিতে বিশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। বাংলাদেশের সাধারণ সামাজিক পরিবেশের থেকে কবিগুরুর পরিবারের স্থান ছিল স্বতন্ত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার ছিল শিক্ষায়-দীক্ষায়, শালীনতায়, ধ্যান-ধারণায়, বেশভূষা ও আচার ব্যবহারে তৎকালীন বাংলাদেশের চলমান সামাজিক জীবন স্রোতের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। ঔপনিষদিক চিন্তা ও পৌরাণিক যুগের ভারতীয় ধ্যান-ধারণার এক অপূর্ব মিলন ঘটেছিল এই পরিবারে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি ও লেখকেরও ছিল ঠাকুরপরিবারে অবাধ সঞ্চরণ। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল স্বদেশপ্রীতির মৃদু সৌরভ। তার ওপর আবার রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রামমোহন রায় প্রবর্তিত ধর্মসাধনার অনুগামী। এই সব কারণেই সমাজে ঠাকুর বাড়ির স্থান ছিল দূরবর্তিতায় এক দ্বীপের মতো। এহেন পরিবারের

সর্বকনিষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল ভৃত্যরাজতন্ত্রের কঠোর শাসনে। তাঁর জীবন ছিল যেন নিয়ম-সংযমে আঁটসাঁট করে বাঁধা। পরিবারে গানবাজনা, নাট্যাভিনয়, কাব্যচর্চা, স্বদেশচর্চা, দেশোদ্ধারের পরিকল্পনা ইত্যাদির প্রসার ঘটেছিল এবং বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও কবি সেখানে ছিলেন আদৃত।

যাই হোক, যে পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল তা ছিল তাঁর কাব্যাভ্যাসের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবির অন্তরের গভীর আবেগ ও সৃষ্টিশীল কল্পনা। বাধ্য হয়ে ছেলেবেলায় চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হতো বলে কবি বালকসুলভ বিলাসমোহে একের পর এক কল্পলোকে স্বপ্নজাল বুনে চলতেন। এই স্বপ্নজালের বেশিরভাগটাই প্রকৃতিকে অবলম্বন করে, হৃদয়োৎসারিত আবেগ ও কুয়াশাচ্ছন্ন অভিজ্ঞতাকে নিয়ে গড়া। এইরকম পরিবেশের মধ্যেই শুরু হল রবি কবির কাব্যচর্চা। এগারো-বারো বৎসর বয়স থেকে আঠারো-উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাই কবিগুরু যে সব কাব্য, গীতিকাব্য, কাব্যোপন্যাস, কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, গাথা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন তার সবগুলিতেই কবির বিশেষ এক মানসধর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। বাইরের জগৎ কবির কাছে অধরা ও অজ্ঞাত ছিল বলেই বিশ্বজগতের সঙ্গে কবির যে সম্পর্ক তা ছিল অস্পষ্ট, কল্পনার আবরণে ঢাকা। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন, ''কিশোর চিত্তকে বাধ্য হইয়াই তখন আপনার মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, একটা 'বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে' বাস করা ছাড়া তাহার আর কিছু উপায় ছিল না। মনের এই অবস্থায় তিল তাল হইয়া উঠে, সুখ-দুঃখের অনুভূতি স্বপ্ন অথবা কল্পনামাত্র হইলেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া দেখা দেয় .....'' (রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ. ৩২) ঠিক এই কারণেই কবির কৈশোরের সব কটি রচনাতে বিধৃত কাহিনী 'বস্তুহীন ভিত্তিহীন' উচ্ছ্বাসের বাষ্পে পূর্ণ ট্র্যাজেডি। এই পর্বের অপরিণত মনের উৎসার হল 'পৃথ্বিরাজ পরাজয়', 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'শৈশবসঙ্গীত', 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাত সংগীত' ইত্যাদি কাব্য, নাট্যকাব্য ও গাথা কবিতাগুলি।

ছেলেবেলায় বাইরের উদার মুক্ত প্রকৃতিকে মুখোমুখি দেখার সুযোগ হয়নি বলে হয়তো 'কবিকাহিনী'র নায়ক —কবির ছদ্মনামের আড়ালে রবীন্দ্রনাথ নিজের অতৃপ্ত ক্ষুধা মিটিয়েছেন, কারণ 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন — ''বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল হইতে দেখিতাম।'' (রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫)। এই ধরনের মানসিক প্রবণতার ফলেই যে এই পর্বে রচিত কাহিনীকাব্যগুলিতে বিশ্বপ্রেমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তা স্পষ্ট। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির যে সুগভীর সম্বন্ধ কবির পরবর্তী জীবনের কাব্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে ছিল, এই সময়কার প্রায় সব কাহিনীতেই তার আভাস রয়েছে। কবিমনের আবেগের অন্যতম প্রকাশ মাধ্যম হল কবিতা। সেটিও কাহিনীগুলিতে সুস্পষ্ট। এছাড়াও পিতা দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা ঔপনিষদিক প্রভাবে প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বনফুল' কাব্যের আদি ও অন্তিম দৃশ্যে যে

তুষার শুভ্র হিমালয় বক্ষের উপস্থিতি ঘটিয়েছেন তা সম্পূর্ণভাবে ঔপনিষদিক প্রভাব সঞ্জাত।

প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কে নিয়েই জগৎ — একথা রবীন্দ্রনাথের পরিণত রচনায় তথা পরিণত জীবনের কাহিনীকবিতায় বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই ভাবের উৎসার যেন 'কবিকাহিনী'তেও মেলে। আবার কবির পরিণত কাব্য জীবনের যে একটি বিশেষ বিষয় অরণ্য ও লোকালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সেই মনোভাবটি ও তপোবনভিত্তিক আদর্শটির যে পরিচয় এই পর্বে রচিত কাহিনীকাব্যগুলিতে লক্ষ্য করা যায় সেই আদর্শটি কবি লাভ করেছিলেন কালিদাসের বিভিন্ন কাব্য ও উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে। প্রকৃতি ও মানুষ একে অপরের পরিপূরক। জীবনে একের থেকে আরেকটিকে পৃথক করে চললে তার পরিণাম হয় শোচনীয়। তাই ত্যাগের আসনে বসে ভোগের আদর্শে কবি বিশ্বাসী। এই অপরিণত কাঁচা বয়সের রচনায় সেই আদর্শেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, পরিণত বয়সের কাব্যে ('নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', ইত্যাদি) কবি যে বিশ্বমৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিলেন, এই পর্বের রচনাগুলিতে সে ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট। সে কারণে রবীন্দ্রনাথের মানস-পরিণতির ধারায় 'বনফুল' ও 'কবিকাহিনী'র গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এছাড়াও 'কবিকাহিনী' ও 'বনফুল' কাব্যে যে ট্র্যাজিক রোমান্সের উপস্থিতি রয়েছে, তাতে কবির পরবর্তী কাব্যগুলিতে অনুসৃত সীমা অসীমের পালা, যা রবীন্দ্রকাব্যে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে, তারও আভাস রয়েছে। যা কবির করতলগত বা যা সীমার বন্ধনে আবদ্ধ তা কবিকে দীর্ঘক্ষণ তৃপ্তি দিতে পারেনি, তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে দূরের নাগাল পাওয়ার জন্য কবি অসীমের সন্ধানে ভ্রমণ করেছেন সমগ্র কাব্যজীবনে বার বার। সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ সুর। যে লিরিক প্রতিভা উত্তর জীবনে কবিকে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে তা এই রচনাগুলির হাত ধরেই যাত্রা শুরু করেছে। 'কবিকাহিনী' ও 'বনফুল' রচনার মাঝে হঠাৎই কিশোর কবি বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গীতিধর্মী যে পদগুলি রচনা করেছিলেন তা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' শিরোনামে রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাণ্ডারে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। এ সময়কালে কবির হৃদয়ে যে বিরহ একটি বড় স্থান অধিকার করে বিরাজ করছিল তা এই গীতিধর্মী পদগুলি পাঠ করলে স্পষ্টই অনুমান করা যায়। এই পদগুলি রচনার প্রেরণা বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদ হলেও এগুলির মধ্যে কবির পরবর্তী পরিণত কবিমানসের পরিচয় রয়েছে। আত্মসমালোচনায় স্বয়ং কবি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র অনুকরণপ্রিয়তার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "একটু বাঁকাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে।" কিন্তু তবুও রবীন্দ্রকাব্যের পাঠক মাত্রেই এগুলিতে কবির মানসধর্মের স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবেন। যে মানস প্রবণতার ফলে 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড' সৃষ্টি হয়েছিল তারই সংযত প্রকাশ রয়েছে এই পদগুলিতে।

কিশোর বয়সে রচিত প্রায় সব কাব্যেই যে এক বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, সে কথা প্রসঙ্গে বলা চলে যে 'ভগ্নহৃদয়', 'কবিকাহিনী', 'রুদ্রচণ্ড' — এই তিন কাব্যের কাহিনীর মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে

অপূর্ব মিল রয়েছে। সব ক্ষেত্রেই নায়ক হলেন কবি। প্রত্যেক কাহিনীর নায়ক-কবিই কাছের জিনিসকে অবহেলা করে দূরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রথমে আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য ধাবিত হয়েছে। অবশেষে বিফল হয়েছে সকলেই। ফলে নিকটের জিনিসটিও হারিয়েছে আবার দূরকেও পায়নি। প্রকৃতপক্ষে দূর ও নিকট — অর্থাৎ বাস্তব ও আদর্শ বা কল্পনার মিলনেই যে জীবনের সার্থকতা — এই তত্ত্বের উপলব্ধি কবির পরবর্তীকালের অনেক রচনাতেই দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'কবিকাহিনী' রচনা করেছেন তখন তাতে যে বিশেষ একটা ভাব লক্ষ্য করা যায় তা কবি 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন — "ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে — তরুণ কবির পক্ষে এটিই বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহা বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায়, তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।" (জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭)। 'কবিকাহিনী'র সমসাময়িক সব কাব্যেই যে নায়ক-কবির সন্ধান পাওয়া যায় সেই কবির প্রথম কর্তব্য নিজের স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা ও দ্বিতীয় কর্তব্য সেই আবিষ্কৃত কবিমনকে কাব্যে প্রতিষ্ঠা দান করা। এ থেকে স্পষ্টই কিশোর কবির রোম্যান্টিক কবিমনের পরিচয়টি পাওয়া যায়। এই পর্বে রচিত অপরিণত রচনাগুলির মধ্যে সৃষ্ট নায়ক-কবি কিন্তু লেখকের সত্তা নয়, কবি নিজেকে যা বলে কল্পনা করেন ও ঘোষণা করতে চান — এটি তাই। এটিই কবি-ব্যক্তিত্ব বা poetic personality, এর কিছুটা বাস্তবের সঙ্গে মেলে আবার কিছুটা মেলেনা। যে অংশটা মেলে সেটা কবির ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্ট, আর যে অংশটা মেলেনা সেটা কবির সচেতন ইচ্ছার বাইরের কোনো শক্তির দ্বারা সৃষ্ট। এই সচেতন ও অবচেতনের মিলনেই যে কবি-ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছে সেটিই এই সময়কার কাব্যগুলির প্রধান নায়ক-কবি চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ যেন এই কাব্যগুলির মধ্যে দিয়ে নিজের তাগিদেই নিজের কবি-ব্যক্তিত্বের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছিলেন।

'শৈশবসঙ্গীত' যেহেতু কবির তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সে রচিত কবিতাগুলির সংকলন গ্রন্থ, সেহেতু এই গ্রন্থটিতে বিধৃত সব গাথা কবিতাতেই পূর্ববর্তী কাব্য ও নাট্যকাব্যগুলিতে আশ্রিত কিশোর কবিধর্মের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। তখন কবির বয়স অপরিণত — বহুসংসার, বিশ্বজীবন তথা মানবজীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা সৃষ্টি হয়নি। তাই গাথাগুলি অকারণ উচ্ছ্বাসের বাষ্পে ভরা, বাক্‌বহুল বর্ণনায় পূর্ণ এবং কাহিনীও অসংগত। এই চিত্তধারা একইভাবে 'সন্ধ্যাসংগীত' পর্যন্ত প্রবাহিত। যে হৃদয়-অরণ্যের মধ্যে তিনি পথ হারিয়ে পথ খুঁজছিলেন সেই একই অকারণ বিষণ্ণতা রয়েছে 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যে। তবে যে কারণে পূর্ববর্তী সমস্ত কাব্যগুলি থেকে 'সন্ধ্যাসংগীত' ভিন্ন আসন দাবি করে তা কবির মনোধর্মের পরিবর্তনের কারণে নয়, তা কবিতা বর্ণনার রীতি-পদ্ধতির জন্য। 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যে যে মনের আবেগ

প্রকাশের ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় তা সম্পূর্ণ কবির নিজস্ব। এখানেও সেই দুঃখানুভব ও অস্পষ্টতা কবিকে ঘিরে রয়েছে। তবে 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর শেষের কয়েকটি কবিতায় দেখা যায় কবির মনের এই অবস্থার সঙ্গে কবি-চিত্তের একটা সংগ্রাম সৃষ্টি হয়েছে। কবি এই ব্যথাতুর জীবনের বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন, কারণ এই বেদনায় ভারাক্রান্ত দিনগুলি তাঁর আর ভালো লাগছে না — জগতের দিকে ফিরে তাকানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে চলেছেন কবি অবিরত। 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যের 'সংগ্রাম সংগীত' কবিতায় এই ভাবটি সুস্পষ্ট —

"হৃদয়ের সাথে আজি
করিব রে করিব সংগ্রাম।
এতদিন কিছু না করিনু
.....
আজি এই হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।"

'সন্ধ্যাসংগীত'-এ যে সংগ্রাম শুরু হল 'প্রভাত সংগীত' কাব্যে তাতে কবি জয়ী হলেন। সেতাই কবিজীবনে 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর সন্ধ্যার অস্পষ্টতা ও কুয়াশা দূরীভূত হয়ে প্রভাতের রবি এসে দেখা দিল 'প্রভাতসংগীত' কাব্যে। সে আনন্দের আবেগ ধরা পড়েছে 'প্রভাত সংগীত'-এর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। কবি বিস্মিত হয়ে লিখেছেন —

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,

এই কবিতাটি রচনার সময় কবিমনের অবস্থাটি স্বয়ং কবি ব্যক্ত করেছেন 'জীবনস্মৃতি'তে —

"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রী-ইস্কুলের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোকে একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৯২)।

বস্তুত এরপর থেকে জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুজগৎ ও মানবজগতের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়কেই কবি মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করতে শুরু করলেন ও হৃদয়ে এক অপার আনন্দ ও উচ্ছ্বাস অনুভব করতে লাগলেন।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন — "শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" (জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ.৪৯২)।

পরবর্তী কাব্য 'ছবি ও গান'-এর অন্তর্গত প্রত্যেকটি কবিতাই কবির উপলব্ধ প্রকৃতি ও মানবজীবনের বিচিত্র ছবি। তিনি দু'চোখ দিয়ে যা দেখেছেন তাকেই কল্পনার রঙে সজ্জিত করে একেকটি ছবি এঁকেছেন এখানে। শুধু তাই নয়, মানব হৃদয়কেও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন; প্রকৃতি ও মানবজীবনের সঙ্গে গড়ে তুলেছেন বহু প্রতীক্ষিত গভীর মধুর সম্পর্ক। তাই এসময়ে রচিত ছোটো ছোটো কবিতায় ধরা পড়েছে অনুভূতিপ্রবণ কবি-হৃদয়টি।

'ছবি ও গান' কাব্যের কবিতাগুলি রচনাকালে কবিমনে যে আবেগ ছিল কড়ি ও কোমল কাব্যে এসে তা খানিকটা ভিন্ন পথ পরিগ্রহ করল। ঠাকুর পরিবারের বধূ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু কবিকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এক নতুন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি দান করে গেল। জীবনকে কবি অনুভব করতে শুরু করলেন — বৃহত্তর জীবনলোকে তিনি উত্তীর্ণ হলেন। মানবজীবনের বিচিত্র দিক কবির কৌতূহলী মনকে আকর্ষণ করল। মানবজীবনের বিচিত্র রহস্যকে উপলব্ধি করতে গিয়ে কবি মানব সাগরতীরে এসে দাঁড়িয়েছেন। ধীরে ধীরে বাস্তব সংসারের সঙ্গে কবির পরিচয় হতে শুরু হয়েছে। এর পরবর্তী সৃষ্টি 'মানসী' কাব্য। জীবন প্রতিমুহূর্তে কবিকে যেভাবে স্পর্শ করেছে সেই ভাবনাই ব্যক্ত হয়েছে সেই সময়কালে রচিত কাব্যে। কবি জীবনের ইতিহাস বিচিত্র বলেই 'মানসী' কাব্যে বিধৃত কবিতাগুলিও বিচিত্র ভাবের। এ সময় কবি যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাই স্বভাবতই যৌবনের আবেগ ও কল্পনা থেকে কবির মনে সৃষ্টি হয়েছে এক অখণ্ড নারীমূর্তি — যিনি অধরা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কবির শৈশব ও কৈশোর যেহেতু ঔপনিষদিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রেম সম্পর্কিত কবি ভাবনা, সেহেতু কবিও উপলব্ধি করেছেন — প্রেমকে খণ্ডরূপের মধ্যে আবদ্ধ করে কামনা করলে তার মাধুর্য বিনষ্ট হয়, অসীমের মধ্যে, অধরার মধ্যেই রয়েছে প্রেমের প্রকৃত সৌন্দর্য ও রস। এই উপলব্ধিটি ধরা পড়েছে 'মানসী'র 'সুরদাসের প্রার্থনা', 'মেঘদূত' ইত্যাদি গল্পভিত্তিক কবিতাগুলিতে। শুধু তাই নয় সমাজ, নিসর্গ ইত্যাদি বিষয়ও কবির এসময়ে রচিত কবিতায় গল্পবীজের আকারে ধরা পড়েছে। তবে সেক্ষেত্রেও কবির উপলব্ধিতে বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রেম যে দেহোত্তীর্ণ, কামনার ঊর্ধ্বে তার স্থান — এই একই ভাবনা থেকে জাত এর সমসাময়িক কালে রচিত 'চিত্রাঙ্গদা' গীতিনাট্য।

'মানসী' থেকে শুরু করে 'চিত্রা' পর্যন্ত কবি প্রেম ও সৌন্দর্যকে বাস্তবের সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে তুলে মানবিক কামনা - বাসনার অতীত এক অপার্থিব লোকে স্থান দিয়েছেন। এই সময়কালের মধ্যে কবি যে কয়েকটি কাহিনীমূলক কবিতা 'মানসী' কাব্যে রচনা করেছেন প্রধানতঃ এটাই তার মূল সুর। কবিতাগুলিতে

তিনি যে কাহিনীগুলির আশ্রয় নিয়েছেন সেগুলির মধ্যে দিয়ে নিজস্ব উপলব্ধিকে রূপ দেওয়াই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল।

'মানসী' পর্বে কবি-মনের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় — একদিকে মর্ত্যপ্রীতির ভাবনা, মানব-হৃদয়ের গহনে প্রবেশের প্রবল আগ্রহ, অন্যদিকে রূপ-সৌন্দর্য-প্রেম বিষয়ক তাত্ত্বিক ভাবনা। রবীন্দ্রকাব্যে পরবর্তীকালে যে সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব একটা বৃহৎ জায়গা করে নিয়েছে তার সূচনা সম্ভবতঃ 'মানসী'র যুগেই

এসময় সাহিত্যের বিচিত্র মাধ্যম যেমন নাটক ('রাজা ও রানী'), গীতিনাট্য ('মায়ার খেলা', 'চিত্রাঙ্গদা'), নাট্যকাব্য ('প্রকৃতির প্রতিশোধ') ইত্যাদি যে কোনো পথেই কবি যাত্রা করে থাকুন না কেন, এ সময়কার কবি-মানস মূলতঃ একটি কথাই বলতে চেয়েছে; তা হল — সংযম। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে পূর্ববর্তী রচনাধারা থেকে 'মানসী' এক স্বতন্ত্র কাব্যরূপ।

এরপর কবির ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনা তাঁকে প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ করে দিল। তাঁর উপর হঠাৎ পারিবারিক দায়িত্ব দেওয়া হল উত্তরবঙ্গ ও তার আশেপাশের কিছু অঞ্চলের জমিদারী তদারকির জন্য। কাজের জন্য তাঁকে তাই শিলাইদহ, সাজাদপুর, কালিগ্রাম, পতিসর, প্রভৃতি পদ্মাবিধৌত স্থানগুলিতে যেতে হত এবং বসবাস করতে হত সেখানে। এর আগে পর্যন্ত তিনি বাইরের জগৎকে, প্রকৃতি ও মানুষকে এতো কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাননি। কারণ যেরকম জীবনযাপনে কবি অভ্যস্ত তাতে সে সুযোগ ঘটার কথাও নয়। তবে অন্তরে এই বস্তুজগৎ ও জীবনকে অত্যন্ত কাছের থেকে জানার ও উপলব্ধি করার একটা তাগিদ থেকেই গিয়েছিল। প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর এতদিনের যে তাগিদ ও কৌতূহল ছিল, তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল। এই অপার প্রকৃতিপ্রেম ও উপলব্ধি কবির 'ছিন্নপত্র' এ লিখিত বহু পত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেখানে বিধৃত একটি পত্রে ইন্দিরাদেবীকে তিনি লিখেছেন

"ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি — ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দু'হাতে বুকের মধ্যে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম না।" (ছিন্নপত্র, ১৮ সংখ্যক পত্র, পৃ. ৫২)। শুধু তাই নয়, মানুষের সঙ্গেও এসময় তিনি আগের থেকে অনেক অন্তরঙ্গ করে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। ইতর প্রাণী জগতকে এবং মানুষের বিচিত্র কার্যকলাপের খুঁটিনাটি বিষয়কে তিনি পরে বর্ণিরূপ দিয়েছেন —

"আমার ডান দিকের পারে চরের উপর চাষারা চাষ করছে এবং মাঝে মাঝে গোরুকে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্ছে; আমার বাম পারে শিলাইদহের নারকেল এবং আম বাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, স্নান করছে এবং উচ্চৈঃস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে; ছোটো অল্পবয়সী মেয়ে তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না। একবার স্নান সেরে উপরে উঠছে, আবার ঝুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুনতে বেশ লাগে।" (ছিন্নপত্র, ৪৩ সংখ্যক পত্র, পৃ. ১০৩)। এই প্রকৃতি ও মানব জগতই 'সোনার তরী'

কাব্যের থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে সৃষ্ট কাব্যগুলিতে স্থায়ী আসন দখল করে নিল। সাধারণ মানুষ, প্রাণীজগৎ। কাহিনীকবিতায় বর্ণিত গল্পের বিষয় ও প্লট হয়ে উঠল। কাহিনী বর্ণনায় এল নতুন ভাবনা — যা তাঁর প্রতিদিনের চোখে দেখা, উলপব্ধ সত্য, তা কাব্যিক রূপ নিল। 'যেতে নাহি দিব' কবিতা তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথ যখন পদ্মাতীরে বাস করতেন তখন জ্যোৎস্নারাত তাঁর চোখে রূপকথার রাজ্য হয়ে ধরা দিত। রূপকথার গল্প রবি-কবির আবাল্যলালিত প্রিয় গল্প। ভৃত্যশাসনে বালক কবি এসব গল্প ছেলেবেলায় বহুবার শুনেছেন। শিলাইদহে এসে পদ্মাতীরে জ্যোৎস্নারাতে এই রূপকথার রাজ্যকেই তিনি আবার খুঁজে পেলেন। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত একটি পত্রে সেই রূপকথার রাজ্যের অপরূপ বর্ণনা রয়েছে — "নদীতে একটি রেখামাত্র ছিল না; ও — ই সেই চরের পরপারে যেখানে পদ্মার জলের শেষ প্রান্ত দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে আর এ পর্যন্ত একটি প্রশস্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্ ঝিক্ করছে, একটি লোক নেই, একটি নৌকা নেই, ও পারের নতুন চরে একটি গাছ নেই, একটি তৃণ নেই — মনে হয়, যেন একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয় হচ্ছে, জনশূন্য জগতের মধ্যখান দিয়ে একটি লক্ষ্যহীন নদী বহে চলেছে, মস্ত একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে, আজ সেই সব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই, কেবল সেই গল্পের 'তেপান্তরের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে।" (ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৩৯, পৃ. ৯৬) সম্ভবতঃ এরই প্রেরণা থেকে জাত 'সোনারতরী' কাব্যের 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা' নামক রূপকথাভিত্তিক কাহিনীকবিতাগুলি

'সোনারতরী' কাব্যের যে মূল সুর ছিল বিশ্বসৌন্দর্যের অনুভূতি, সেই অনুভূতিই অত্যন্ত গভীর ও পরিপূর্ণ রূপে দেখা দিল 'চিত্রা' কাব্যে। 'চিত্রা' কাব্যের প্রায় সব কটি কবিতাতেই রয়েছে বিশ্বসৌন্দর্যের আদি রূপ সৌন্দর্যময়ীর সাধনা ও তার জয়গান। সৌন্দর্যের আদিরূপ যে abstract এবং কামনা-বাসনা-ভোগের অতীত একটা প্রেরণামাত্র — এই ধারণাই কবি ব্যক্ত করেছেন এই কাব্যের 'আবেদন', 'বিজয়িনী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' ইত্যাদি গল্পভিত্তিক কবিতাগুলিতে।

রবীন্দ্রকাব্যধারায় 'চৈতালি'তে এসে একটা বাঁক লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববর্তী 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা' ইত্যাদি কাব্যে কবি জগৎজীবন, প্রকৃতি ও মানবকে উচ্ছ্বাসে, আবেগে, কল্পনায় অনুভব করেছিলেন, আর 'চৈতালি' রচনাকালে কবির সেই অনুভব গভীর উপলব্ধিতে পরিণত হল। কবি ধীর-স্থির-শান্ত ভাব নিয়ে মনের ক্যামেরায় অত্যন্ত অল্প পরিধির মধ্যে অথচ স্পষ্টরূপে বস্তুজগৎ ও প্রাণী জগতকে দেখেছেন এবং ছোট্ট ছোট্ট গল্পের মতো একেকটি চিত্র তুলে ধরেছেন কবিতায়। সেই সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আপন উপলব্ধ বিশিষ্ট দর্শন ও আদর্শটি। তাই 'চৈতালি'র ছোট্টো ছোট্টো গল্পবীজভিত্তিক কবিতাগুলিতে অতিসাধারণ মানুষের জীবন ও তার তুচ্ছতম ঘটনার মধ্যে অসীম গৌরব ও মহত্ত্বকে রূপ দিয়েছেন। 'দেবতার বিদায়', 'পুণ্যের হিসাব', 'বৈরাগ্য', 'কর্ম', 'স্নেহদৃশ্য', 'করুণা', 'পট্টি' ইত্যাদি কবিতায় বিধৃত গল্পখণ্ডগুলিতে

তা সুচারুরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

এই সময়কালে জীবনের যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব,গভীর উপলব্ধি, জ্ঞান, নীতিবোধ, আদর্শ ইত্যাদি গভীরভাবে কবির মনকে নাড়া দিয়েছিল, তারই কবিত্বমণ্ডিত প্রকাশ রয়েছে 'কণিকা' কাব্যের অতি ক্ষুদ্র গল্পকণাগুলিতে 'হারজিত', 'ভার', 'কীটের বিচার', 'উচ্চের প্রয়োজন' প্রভৃতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গাল্পিক ঢঙে বর্ণিত কবিতাগুলি পাঠ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

একই সময়কালে রচিত হয়েছিল 'কল্পনা' কাব্যের কবিতাগুলি। কবি কালিদাসের কাব্য পাঠ করার ফলে একদিকে যেমন অতীতের কালিদাসের যুগের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন, অন্যদিকে তৎকালীন ভারতবর্ষের লোকদেখানো স্বদেশীয়ানাও কবিকে ব্যথিত করেছিল। আবার সমাজের অসঙ্গতিও কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। এ সবই কবিতার আকারে স্থান পেয়েছে 'কল্পনা'য়। তবে এখানে কবিমনের ভাবের প্রকাশরূপে উল্লেখ্য একমাত্র কাহিনী কবিতা 'জুতা আবিষ্কার'। সে যাই হোক, এ সময়কালে কবির মানসধর্মটি যে একটি বিশেষ পথেই যাত্রা করেছে — অতীতের আদর্শের প্রতি আগ্রহ, ত্যাগ নীতিবোধ — একথা বেশ স্পষ্ট।

'চৈতালি' ও 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবি মনের যে আদর্শ ও নীতিবোধ পরিবেশনের ইচ্ছাটুকু খুঁজে পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি ও অতীত আদর্শের প্রতি অনুরাগের পরিচয় মেলে সেই মানস-জগতেরই সৃষ্টি তার অব্যবহিত পরবর্তীকালে রচিত 'কাহিনী'র নাট্যকবিতাগুলি ও 'কথা'র আখ্যানভিত্তিক কবিতাগুলিতে। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে গ্রন্থ প্রকাশের ক্রম পরপর হলেও 'চৈতালি', 'কণিকা', 'কাহিনী' (নাট্য কবিতা), 'কথা' কাব্যের প্রায় সবকটি কবিতাই কবির একই মানস জগতের সৃষ্টি। এ সময়কালে রচিত রচনাগুলিতে কবির একই মনের বিচিত্র ভাবের প্রকাশ ধরা পড়েছে। অথচ রূপের দিক থেকে 'কাহিনী'র সঙ্গে 'কণিকা' অথবা 'কথা'র সঙ্গে 'কল্পনা'র কতো প্রভেদ। 'কাহিনী'র কটি নাট্যকবিতাগুলিতে আছে ('গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ') ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের গল্প। তবে যে যুগে বসে কবি কবিতাগুলি রচনা করেছেন তাতে স্বভাবতই কবির আধুনিক মনের পরিচয়ের প্রভাব থাকার কথা। বস্তুতঃ তাই ঘটেছে। অতীতের যে বিষয়গুলি, মানুষের কার্যকলাপের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি কবির কাছে অমানবিক ও মানবধর্মের বিরোধী বলে মনে হয়েছিল, কাহিনীগুলি বর্ণনার সময় সুকৌশলে তার প্রতি তিনি কটাক্ষপাত করেছেন। ফলে প্রয়োজন অনুসারে কবিতায় আশ্রিত অতীতের কাহিনী কবির আপন মনের মাধুরীতে পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে।

'কথা' কাব্যগ্রন্থের উপাদানও ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে আহরণ করা। আমাদের অতীত ইতিহাসের অসংখ্য ছোটো ছোটো আপাততুচ্ছ ঘটনা ও কাহিনীর মধ্যে যে ত্যাগ, ক্ষমা, বীরধর্ম এবং মানবমহত্ত্বের যে সব গুণ প্রকাশ পেয়েছে তাকে ভিত্তি করেই 'কথা'র কাহিনীমূলক কবিতাগুলি রচিত। 'বন্দীবীর', 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা', 'পূজারিনী', 'পণরক্ষা', 'বিবাহ' ইত্যাদি সব কাহিনীকবিতাগুলিতেই কবির এ ধরনের মানস-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য

করা যায়। 'কথা ও কাহিনী' একত্রে প্রকাশিত হওয়ার সময় 'কাহিনী' অংশে যে কবিতাগুলিকে সংকলন করা হল সেগুলি পূর্বে বিভিন্ন কাব্যরচনার সময় রচিত। যেমন — 'চিত্রা' কাব্যের 'ব্রাহ্মণ', 'ভাষা ও ছন্দ', 'কল্পনা' কাব্যের 'জুতা আবিষ্কার' ইত্যাদি। তাই এগুলিতে কবির মানস-বিবর্তনের সেই ধারাটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যা 'কথা' কাব্য পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেল। তবে এগুলিতে কবির মানস-বৈশিষ্ট্যের একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় — তিনি 'কাহিনী' কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতাতে আখ্যানের মাধ্যমে মানবধর্মের জয় ঘোষণা করেছেন এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতি বশত তাদের কথাকে, সমাজের কুসংস্কারকে কাহিনীর আকার দান করেছেন।

'কল্পনা' কাব্য রচনার পরপরই 'ক্ষণিকা' কাব্যটি রচিত (১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)। এখানে তিনি আর ত্যাগ, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য ইত্যাদির কথা ভাবেননি; জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন সত্য দৃষ্টি দিয়ে এবং তাতেই আনন্দ অনুভব করেছেন হৃদয়ে। তবে এক্ষেত্রে কাহিনীকাব্য রচনার কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না।

'ক্ষণিকা' যে বৎসর রচিত সেই একই বৎসরের শেষের দিকের (১৩০৭ সনের শেষাশেষি) সৃষ্টি 'নৈবেদ্য'। 'চৈতালি' কাব্য রচনার সময় থেকেই লক্ষ্য করা গেছে যে কবি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের মধ্যেই মানব মহিমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ উপলব্ধি করেছিলেন। আবার দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কবিকে ব্যথিত ও আলোড়িত করেছিল। এই ভাবটি 'কথা ও কাহিনী'র আখ্যানভিত্তিক কবিতাগুলিতে পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করা গেল। 'নৈবেদ্য'র প্রথম দিককার বেশ কিছু কবিতায় এই ভাবটি স্পষ্ট। তবে 'নৈবেদ্য'র কবিমানস পূর্বের তুলনায় আরও দৃঢ়, স্পষ্ট ও পূর্ণতার আকার নিয়েছে। 'নৈবেদ্য'র সব কবিতাই প্রার্থনা বা স্বদেশ সম্পর্কিত প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে এগুলিতে — যার মধ্যে রয়েছে অধ্যাত্ম আদর্শ। কারণ কবির স্বদেশ সাধনা ছিল অধ্যাত্মসাধনারই একটি দিক। তবে এই অধ্যাত্মসাধনাই আবার 'নৈবেদ্য'র শেষদিকের বেশ কিছু কবিতায় স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ অধ্যাত্মসাধনায় পরিণত হয়েছে। এ সাধনা ছিল উপনিষদের প্রেরণা সঞ্জাত। শাস্ত্রজ্ঞান নয়, ধর্মসংস্কার নয়, খণ্ডিত কোন আকারে নয়; কবির ভগবতোপলব্ধি মানবজীবন তথা বিশ্বজীবনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলো। যার প্রকাশ ঘটলো 'নৈবেদ্য'তে — আত্মসমর্পিত এক ভক্ত কবি মনের ভাষায় তার আকুতি প্রকাশ করেছেন এ কাব্যে। তবে যেহেতু কবিমন শান্ত, সমাহিত, ভাবগম্ভীর ও আত্মমগ্ন তাই এ সময় কোনো কাহিনী কবিতা গড়ে ওঠেনি।

যে কোন কবির ক্ষেত্রেই তাঁর মানস-বৈশিষ্ট্য খুঁজতে গেলে ব্যক্তিগত জীবন তার সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। ১৩০৯, ৭ অগ্রহায়ণ কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হল। এই মৃত্যু কবির মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিল — সৃষ্টি হল 'স্মরণ'। এখানে কবির বক্তব্য সংযত, গম্ভীর, শান্ত ও সংক্ষিপ্ত। তাই স্বভাবতই কবিতায় গল্প পরিবেশনের কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ কিছুই ছিল না, থাকার কথাও নয়।

কবির স্ত্রীর মৃত্যুর পর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা (১০ বৎসর) ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের (৮ বৎসর) পক্ষে

পোষণের জন্য কবিকে কিছুদিন তাদের নিয়ে কাটাতে হল। এসময় এরাই যেন কবির শোকার্ত জীবনে পরম সান্ত্বনাস্থল। আবার পুত্র শমীন্দ্রনাথ তখন অন্তিম রোগশয্যায়, কন্যা মীরাও ছিলেন কঠিন রোগাক্রান্ত। এমনই এক মানস পরিবেশের সৃষ্টি 'শিশু' কাব্যটি। এই কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতাতেই পাঠক এক সন্তানবৎসল পিতাকে খুঁজে পান; যিনি কবিতা রচনা করতে গিয়ে প্রবেশ করেছেন শিশুর অন্তর্লোকে। আবার একথা মনে করাও অসঙ্গত নয় যে, 'শিশু' কাব্যের অধিকাংশ কবিতার নায়ক খোকার মধ্যে কবিগুরুর শৈশবকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাই এসময় সৃষ্টি হয়েছে 'মাস্টারবাবু', 'বীরপুরুষ', 'রাজারবাড়ি' ইত্যাদির মতো শিশু-মনস্তত্ত্বভিত্তিক কবিতাগুলি। শিশু মনের কল্পনাকে ভিত্তি করে রচিত এসব কবিতায় সামান্য হলেও গাল্পিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্র কবি-মানসের বিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে এরপরই যে কাব্যটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা প্রয়োজন তা হল 'উৎসর্গ'। এই কাব্যের কবিতাগুলি ১৩০৮ ও ১৩১০ সনে লিখিত। তখন মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় 'কাব্যগ্রন্থ' সম্পাদনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সেই 'কাব্যগ্রন্থ' এর একেকটি কবিতা গুচ্ছের ভূমিকা রূপে যে একেকটি কবিতা কবিগুরু রচনা করেছিলেন, সেই কবিতাগুলিই 'উৎসর্গ' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাই এই কবিতাগুলির কোনোটির সঙ্গে কোনোটির ভাবের সঙ্গতি তেমন নেই। তবে এগুলি পাঠ করলে কবিমানসের বিভিন্ন ঋতুর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে স্বভাবতই এ সময় কোনো কাহিনীমূলক কবিতা রচিত হয়নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কবির মানসলোকের বিবর্তন আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই কবির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের আলোচনা জরুরি। বঙ্গবিচ্ছেদের ঢেউ বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের উপর যেভাবে হঠাৎ আছড়ে পড়ল তাতে যেমন বাংলাদেশের পরিস্থিতি হঠাৎ সর্বক্ষেত্রে বদলে যেতে শুরু করল তেমন কবির বহির্জীবনেও এল এক পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথের মনে পূর্বেই যে স্বদেশী ভাবনা জাগ্রত ছিল তার পালে লাগল নবজীবনের এই স্বদেশী হাওয়া। এ সময়কার রাষ্ট্রিয় ও সামাজিক সমস্যা কবিচিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দিতে লাগল। কবি জড়িয়ে পড়লেন বাইরের বিচিত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে — এমনটা এর আগে বা পরেও কখনো জড়িত হন নি। তাই তাঁর সৃষ্টিতেও তার প্রভাব পড়ল। এ সময়কালে রচিত বিভিন্ন কবিতায় তাই স্বাজাত্যবোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে। এ তো গেল বহির্জীবনের কথা। অন্তর্জীবনেও ছিল প্রবল এক বিচ্ছেদবেদনা। ১৩১০ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দের মধ্যে একে একে কবি হারালেন তাঁর আপনজনদের। আশ্বিন ১৩০৯-এ তো চলে গেছেন স্ত্রী, ১৩১০ সনে হারালেন প্রিয়তমা কন্যা রেণুকাকে, ১৩১০ সনেই চলে গেলেন পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩১৪ সনে হারালেন কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথকে। এতোগুলি মৃত্যু কিন্তু কবির বহির্জীবনের ক্রিয়াকলাপে কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারলো না। তবে এ সময়কালে রচিত (১৩১২-১৩১৩) 'খেয়া' কাব্যে বিধৃত কবিতাগুলি অনুধাবন করলে এই সময়কার কবির মানস-পরিবেশের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে রয়েছে কবিতায় স্বাজাত্যবোধের উন্মাদনা, অন্যদিকে একপ্রকার হতাশা ও বিষাদ। কারণ কবি ভাবছেন —

এই যে একের পর এক মর্মান্তিক বিচ্ছেদ তা হয়তো তাঁর জীবনে অন্তরতম জীবনদেবতার আগমনকে নিকটতর করছে। প্রতিমুহূর্তে তাই তিনি অন্তর-দেবতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য শান্ত, স্থির, অচঞ্চল মন নিয়ে তাঁর প্রার্থিত জীবনদেবতার সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলেছেন। ভাবছেন দিনের আলো তো ফুরিয়ে আসছে অথচ এখনো অধ্যাত্মজীবনে তিনি প্রবেশ করতে পারলেন না। এই হতাশা জনিত বেদনা ঝরে পড়েছে 'খেয়া'র অধিকাংশ কবিতায় রূপকের আধারে। এ সময় কোনো কাহিনীকবিতা রচনার মানসিকতা কবির মনে সক্রিয় ছিল না।

'খেয়া'-র পরবর্তী কাব্যগুলি 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'। সবকটিই কবির ভগবদ্-রসের কাব্য। তবে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট যে, 'খেয়া'তে পরম 'রসময়'কে পাবার জন্য যে আকুলতা ও হতাশা প্রকাশ করেছিলেন, 'গীতাঞ্জলি'তে তা আরো প্রবল আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। কিভাবে নিজেকে দুঃখের অনলে পুড়িয়ে নির্মল ও পবিত্র হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া যাবে তারই বিচিত্র প্রচেষ্টা রয়েছে এখানে। আর 'গীতিমাল্য'তে কবির সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতি অনেকটা পরিণত। তিনি প্রিয়তম ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার আশার আলো দেখতে পেয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত 'গীতালি'তে পৌঁছে কবি অবশেষে প্রিয়তমকে লাভ করেছেন। উপলব্ধি করেছেন সুখের মধ্যে থেকে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। এই ভগবদ্-রসলীলাবাদের যুগে বসে কবি কখনোই বিষয়মুখী এমন কোনো চিন্তা ভাবনায় মনোনিবেশ করেননি যা গল্প, আখ্যান বা কাহিনীর জন্ম দিতে পারে। 'গীতালি'র গানগুলি শেষ হতে না হতেই কবির মনোজগতে এক বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এ সময় হঠাৎ কবির কানে এসে পৌঁছালো পথের আহ্বান। তাঁর এতোদিনের আরাধ্য দেবতাকে যখন তিনি 'গীতালি'তে আপন করে পেলেন তখনই তাঁর মনে হল প্রিয়তমকে লাভ করার জন্য তাঁর যে দীর্ঘদিনের আকুলতা ছিল তা সম্পূর্ণভাবে ছিল জগৎ ও জীবনবিমুখ একাকী সাধনা। এতে কখনো সাধনার চরম চরিতার্থতা আসতে পারে না। তাই সৃষ্টির মধ্যে, জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে কবি তাঁকে উপলব্ধি করতে চাইলেন, একজন পথিক রূপে তাঁকে দেখতে চাইলেন। তাই বলা চলে 'বলাকা'য় এসে রবীন্দ্রকাব্য হঠাৎ গতি পরিবর্তন করেছে। কবি এসময় হারিয়ে যাওয়া পরোনো নিসর্গবোধ ও ধরণীর প্রতি মমতাবশত নিজের জীবনকে যৌবনের আনন্দে, সৃষ্টির উন্মাদনায়, গতির আবেগে ও ছন্দে মাতিয়ে 'বলাকা' কাব্য রচনায় হাত দিলেন। একেকটি চিন্তা এসময় তাঁর মনে উদিত হয়েছে আর অপূর্ব ভাষায়, সংগীতে, ঐশ্বর্যে সজ্জিত করে তিনি তাকে কাব্যরূপ দান করেছেন। এমনই চিন্তাপ্রসূত সৃষ্টি হল 'ছবি', 'শা-জাহান' ইত্যাদি কাহিনীধর্মী কবিতাগুলি। সুসংগঠিত কাহিনীকবিতার জন্ম এসময়কালে তেমন আর ঘটেনি। আবার 'বলাকা'র কবিতাগুলির মধ্যে বাহ্যিক বিষয়গত যোগ নেই কিন্তু সব ক'টি কবিতাই একটি বিশেষ দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত — গতিই একমাত্র সত্য, গতির মধ্যে দিয়েই নির্দিষ্ট পথে ধাবিত হয়ে জীবনে আনন্দরসে অবগাহন কর যায়; এই দার্শনিক সত্যই প্রত্যেকটি কবিতায় ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে। 'বলাকা' কাব্যে প্রকাশিত কবি-মনের এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করে বলা চলে যে, এখানে এসে কবি যেন পেছন ফিরে তাকিয়েছেন যৌবনের দিকে। কবির ভাষাতেই এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে —

"বহু দিনকার
ভুলে যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।" ('বলাকা', ১৩ নং কবিতা)

'বলাকা'য় কবি উপলব্ধি করলেন যে, নিরন্তর চলার মধ্যেই রয়েছে জীবনের প্রাণশক্তির প্রকৃত প্রকাশ ও চলার ছন্দেই রয়েছে জীবনের সত্য; কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। আর 'পলাতকা'য় যে ধারণাটি ব্যক্ত করলেন তা হল — মানবজীবনের হাসি-কান্না, মান-অপমান, অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার প্রেম, লজ্জা এসবই জীবনের চলার সাথে কোথায় যেন হারিয়ে যায় — এসবের স্থায়ী কোনো মূল্য নেই। রেখে যায় শুধু ক্ষণিকের জন্য একটা অসামান্য রসমাধুর্যের ছোঁওয়া। ভাবধারার দিক থেকে 'বলাকা' ও 'পলাতকা' একই; তবে 'বলাকা'র গাম্ভীর্যপূর্ণ ছন্দ ও ভাষা থেকে 'পলাতকা'য় একেবারেই ভিন্ন প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। অসম ছন্দে তিনি হালকা লঘু অতি সাধারণ কথায় পদ্যে গল্প বলা শুরু করলেন 'পলাতকা'য়। এ সময়কালেই গদ্যে রচিত ছন্দোময় গল্পসমষ্টি হল 'লিপিকা'। 'পলাতকা' কাব্যের কাহিনীকবিতাগুলিতে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, প্রত্যেকটি কাহিনীর নায়িকাই বিভিন্ন বয়সের স্ত্রীলোক। গল্পগুলির প্রত্যেকটিরই পরিণতি হয়েছে বিচ্ছেদ, বিদায় বা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। 'পলাতকা'র প্রত্যেকটি কাহিনীতেই কবির মানবজীবন সম্পর্কে তীক্ষ্ণ অনুভূতি, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, সমবেদনা, সামান্যের মধ্যেও অসামান্যতার আবিষ্কার ইত্যাদি ক্ষমতা কবিত্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে অপূর্ব সহজ সরল কাহিনীকবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'পলাতকা'র 'মুক্তি', 'ফাঁকি', 'মায়ের সম্মান', 'নিষ্কৃতি' ইত্যাদি কাহিনীকবিতাগুলি পাঠ করলেই তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

'পলাতকা' কাব্যের কবিতাগুলিতে কাহিনীর আকারে কবির বিচিত্র মনোভাবের প্রকাশ ঘটলেও পরবর্তী 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে তিনি এই মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তন করলেন। অবশ্য উভয় কাব্যের রচনা কালের ব্যবধান প্রায় পাঁচ বৎসর। 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে কবি শিশুমনের গহনে প্রবেশ করে তাদের জীবনের বিচিত্র খেয়ালকে গাল্পিক ঢঙে কবিতায় প্রকাশ করলেন।

এরপরই ১৩৩১ বঙ্গাব্দে কবি দক্ষিণ আমেরিকা ও ইতালি ভ্রমন করেন। এই সময় যে কবিতাগুলি রচনা করেছেন সেগুলি 'পূরবী' কাব্যে স্থান পেয়েছে। 'পূরবী'র কবির মানস-বৈশিষ্ট্যটি একেবারেই স্বতন্ত্র। এখানে দেখা যায় যে, বার্ধক্য যদিও তাঁকে স্পর্শ করেছে কিন্তু তবুও তিনি যৌবনের সেই আনন্দ মুখর সুন্দর দিনগুলিকে একবার পেছনে ফিরে দেখেছেন — ফিরে পেতে চেয়েছেন সেই যৌবনকে। শান্ত, স্থির, গম্ভীর, একজন সাধক কবিকে পাঠক এখানে আবিষ্কার করে। তবে কবির মন-ঋতু এক্ষেত্রে কোনো কাহিনীকবিতা

রচনার সহায়ক হয় নি।

প্রকৃতির ছয় ঋতুর আবর্তনের মধ্যে যেমন একটির সঙ্গে আরেকটির একটা প্রচ্ছন্ন ধারাবাহিক সূত্রে আবদ্ধতা রয়েছে, তেমনি কবির মনের মধ্যে ঋতুপরিবর্তনের মতোই একটা প্রচ্ছন্ন যোগসূত্র বর্তমান। হয়তো 'বলাকা' কাব্যে কবির মন-ঋতু 'পূরবী'র সঙ্গে এক নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে একেবারেই যোগ নেই তা বলা যাবে না। 'পূরবী'তে কবিতাগুলির মধ্যে যে শান্ত, সমাহিত ভাবনা ছিল, পরবর্তীকালে রচিত 'মহুয়া'র মধ্যে সেই ভাবনা অনেকটাই লঘু। তবে যে বিষয়টিতে গভীর মিল লক্ষ্য করা যায় তা হল, কবির মনে যে বসন্তের সূচনা হয়েছিল 'পূরবী'তে, তা যেন 'মহুয়া'তে পরিণতি পেল। 'মহুয়া'র সব কবিতাই প্রেমের। তবে এ প্রেম অতীন্দ্রিয় নয়, তা জগতের মানুষের স্নেহ প্রেমের কথায় পূর্ণ। যে প্রেম নর নারীর লীলায় সীমাবদ্ধ নয়, যে প্রেমের শক্তি মানুষকে অপরাজেয় হতে সাহায্য করে — এমনই প্রেমের মহিমার জয় ঘোষণা করেছেন কবি এই কাব্যে। 'সাগরিকা' শীর্ষক কাহিনীকবিতায় কবি প্রাচীন ইতিহাস ও অতীতচারী মনকে সম্বল করে এমন প্রেমেরই জয় ঘোষণা করেছেন।

এর পরবর্তী 'পরিশেষ' কাব্য রচনাকালে কবির বয়স ৭০ বৎসর অতিক্রম করেছে। স্বভাবতই মৃত্যুচিন্তা কবিকে আরও বেশি করে স্পর্শ করেছে। কিন্তু তাতে তিনি ভেঙে পড়েননি বা কাতর হননি। কারণ তিনি জানেন মৃত্যুই জীবনের শেষ কথা নয়, তা রূপ পরিবর্তন মাত্র। তবে এই পর্যায়ে কবিমন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের অনুভূতি, কবিকর্ম, কবিকৃতির স্বরূপ, ব্যক্তিজীবনের স্বরূপ, মৃত্যুর স্বরূপ, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সম্বন্ধ — এসব বিষয়ে শেষ বারের মতো হিসাব নিকাশ করেছেন। এছাড়াও 'পরিশেষ' কাব্যে কিছু কিছু কবিতায় রয়েছে রোম্যান্টিক প্রেমের অনুভূতির প্রকাশ। বেশ কিছু কবিতায় কবিকে জীবনদেবতা লীলাসঙ্গিনীর স্মৃতিচারণা করতে দেখা গেছে। এই কাব্যের কয়েকটি কবিতায় কবির প্রাচ্যদেশ সম্পর্কিত ভাবনা ধরা পড়েছে। এহেন বিচিত্র স্বাদে পূর্ণ 'পরিশেষ' কাব্যে 'স্পাই', 'বালক', 'নূতন শ্রোতা' 'আরেক দিন' প্রভৃতি কবিতায় রয়েছে গল্পাভাস।

'পরিশেষ' কাব্যে কবি যে আত্মজিজ্ঞাসার সমাধান চেয়েছিলেন অথচ সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে পারেননি সে কথাই পুনরায় বলতে চেষ্টা করলেন 'পুনশ্চ' কাব্যে। জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রকাশ তাই 'পুনশ্চ' কাব্যের কাহিনীকবিতাগুলিতে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। এ সময় কবি মানুষের জীবনকে অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও তাদের কথাই বলেছেন এই কাব্যের কাহিনীকবিতাগুলিতে। কবিমানসের ঐশীপ্রেরণাবর্জিত মানবমুখিনতা এই কবিতাগুলিতে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। আবার কতোগুলি কাহিনীতে আধুনিক জীবনের প্রেক্ষাপটে প্রেমের জটিলতার কথা বর্ণিত হয়েছে।

'ক্যামেলিয়া', 'শেষ চিঠি', 'ছেড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ছেলেটা' ইত্যাদি কাহিনীকবিতাগুলিতে পাঠক মাত্রেই উপরোক্ত মানস লক্ষণগুলির সন্ধান পেয়ে থাকবেন। আবার কোথাও কোথাও কবিতার কাহিনীতে

কবির আত্মিক জীবনের স্মৃতিকে খুঁজে পাওয়া যায়; যেমনটা পাওয়া যায় 'শেষ চিঠি' কবিতায়। এই কবিতায় অমলার পিতার যে বেদনা তা যেন কবিরই আত্মি-জীবনের স্মৃতি। বস্তুতঃ এই কবিতা লেখার প্রায় চৌদ্দ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৬ই মে ১৯১৮ সালে কবির অতি প্রিয় জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলাদেবী পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। আবার আরেকটি ঘটনার যোগ থাকাও অস্বাভাবিক নয়। কবির একমাত্র দৌহিত্র নীতীন্দ্র, যিনি কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর পুত্র - জার্মানীতে (২১ শে শ্রাবণ, ১৩৩৯) মারা যান। নীতীন্দ্রের জন্যও তাঁর মন ছিল সে সময় কাতর। সম্ভবত এসব ঘটনারই প্রকাশ ঘটেছে 'শেষচিঠি' কবিতায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'পলাতকা'র 'শেষপ্রতিষ্ঠা' ও 'পুনশ্চ'র 'বিশ্বশোক' এই বিষয়কে অবলম্বন করেই রচিত।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলির পাঠ করলে দেখা যায় যে কবি মাটির মানুষের প্রতি তাঁর দরদী দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। কিন্তু 'পুনশ্চ' কাব্যে কবি মাটির কাছাকাছি এসে মাটির মানুষগুলিকে মৃন্ময়ীই দেখেছেন। এই কাব্যের পূর্ববর্তী কবিতাগুলিতে কবি যে সব সাধারণ মেয়ে ও বধূর বিপর্যয়পূর্ণ জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন সেখানে বাস্তববোধ থাকলেও তারা কবির লেখনির ইন্দ্রজালে স্বর্গীয় মহিমা লাভ করেছে। কিন্তু 'পুনশ্চ' কাব্যে তিনি নারীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেও তারা স্বর্গীয় দ্যুতিলাভ করেনি; অতি সাধারণ বাস্তব জগতের একজন মানুষরূপেই কবি তাদের দেখেছেন, অনুভব করেছেন ও তাঁর কাহিনীর নায়িকার আসনে বসিয়েছেন। তাদের কি হওয়া উচিৎ ছিল সে সমাধানে না এগিয়ে তারা আসলে কেমন বা তাদের গুণপনাগুলি কি - সেই দিকটির ওপরই কবিকে আলোকপাত করতে দেখা গেল 'পুনশ্চ' কাব্যের বেশ কিছু কবিতায়। 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার কাহিনীর নায়িকা এমনই বাস্তব সংসারের এক অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে। মেয়েটির বেদনাদীর্ণ হৃদয়ের নিখুঁত পরিচয় দিয়েছেন কবিগুরু কাহিনীকবিতাটিতে।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকবিতাগুলি পাঠ করলে লক্ষ্য করা যায় যে কবি নেহাৎ গল্পরচনার জন্যই সেগুলি লেখেননি। বিভিন্ন সময় রচিত বিভিন্ন কবিতায় গল্পের মাধ্যমে কবির নীতিকথা বা জীবনের কোনো সত্যকে উপলব্ধির কথা ব্যক্ত হয়েছে। এমনভাবেই কবির অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ সম্পর্কিত ধারণাটি বাণীরূপ পেয়েছে 'পুনশ্চ'র 'রঙরেজিনি', 'শুচি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নান সমাপন' ইত্যাদি কাহিনীকবিতাগুলিতে।

'পুনশ্চ' রচনা ও প্রকাশের পরই রবীন্দ্রমানস ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে। এসময় বিভিন্ন চিত্রশিল্পীগণের আঁকা ছবি দেখে কিছু কবিতা তিনি রচনা করেন। এই চিত্রগুলির বর্ণনায় কবির ভাব ও কল্পনা চিত্র অতিক্রম করে বিচিত্র রূপে ও রসে মূর্ত হয়ে হঠাৎ ধাবিত হয়েছে। এখানে যথার্থ কোনো কাহিনীকবিতার অস্তিত্ব না থাকলেও কবির মুক্তপক্ষ মনটিকে বুঝে নেওয়ার জন্য এ আলোচনা জরুরি ছিল।

'পুনশ্চ' কাব্যে কবি পদ্যে গদ্যছন্দে একেরপর এক আখ্যানধর্মী কবিতাগুলি সৃষ্টি করে গেছেন অথচ পরবর্তী 'শেষসপ্তক' কাব্যের ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত মনোভাবনা লক্ষ্য করা গেল। শুধু তাই নয়, এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রমানসের ক্রমপরিণতির ইতিহাসে একটা স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে। কারণ 'শেষসপ্তক' কাব্যরচনার থেকেই

কবির ভাবজীবনে ঔপনিষদিক যুগের আরম্ভ; যা তার পরবর্তী কাব্য 'বীথিকা', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী'কে অতিক্রম করে 'শেষলেখা'তে গিয়ে পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করেছে।

জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের তথা মননের শ্রেষ্ঠ অনুভবগুলিকে একেরপর এক গেঁথেছেন এই 'শেষসপ্তক' কাব্যে। তাই স্বভাবতই এই কাব্যের কবিতাগুলি মননের বিচিত্র সুরে ও ভাবনায় রচিত। এই কাব্যে যে সব বিচিত্র ভাবনাপ্রকাশক কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হল --- নিরাসক্ত ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের দিকে ফিরে তাকানো, জগতের সৃষ্টি-রহস্য উন্মোচনের প্রচেষ্টা, মানবাত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, ঈশ্বর তথা বিশ্বাত্মার স্বরূপ সন্ধান, বিশ্ব জীবনের স্রোতধারার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনকে মেলানোর প্রয়াস, সুখ-দুঃখের, বিরহ-মিলনের, হারানো-প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিরোধহীন এক আনন্দজগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রেমানুভূতি ও অতীতচারণার কিছু মধুর কথা। সেসব কথা বলতে গিয়েই অন্যান্য বিচিত্র ভাবপ্রকাশক কবিতাগুলির পাশাপাশি দু'একটি কাহিনীধর্মী কবিতা (৩১, ৩২, ৩৩ সংখ্যক) লিখেছেন কবি। ৩১ সংখ্যক কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে বিরহ বেদনায় ভারাক্রান্ত এক করুণ কাহিনীকে ঘিরে কবিমনের বেদনা ও আর্তি। আবার ৩২ সংখ্যক কবিতায় যে কাহিনীটি স্থান পেয়েছে তা কবির বাল্যকালে বুড়ো মোহন সর্দারের কাছ থেকে পিলসুজের উপর জ্বালা মৃদু প্রদীপের আলো-আঁধারি পরিবেশে বসে শোনা রূপকথার রঘু ডাকাতের গল্প। বৃদ্ধ বয়সে কবির স্মৃতিতে সেই কাহিনী এসে ঠাঁই করে নিয়েছে। ৩৩ সংখ্যক কবিতায় দেখা যায় শিখ ধর্মের যে মহান আদর্শ ও সত্যের জন্য আত্মত্যাগ --- সেই বিষয়টি আদর্শবান কবির মনকে নাড়া দিয়েছে। তাই শিখবালক নেহাল সিং-এর জীবনের আদর্শের দিকটিকে তুলে ধরেছেন কাহিনীতে। এভাবেই দেখা যায় স্মৃতির পথ বেয়ে উঠে আসা বিভিন্ন বিষয় এপর্বের লেখা কাহিনী কবিতায় স্থান পেয়েছে। তবে এতো বিচিত্র ভাবনার প্রকাশ বাহ্যিকভাবে লক্ষ্য করা গেলেও 'শেষ সপ্তক' কাব্যে কবির মননের যে মূল একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হল, এ সময় তিনি ভাবুক ও অতীতচারী মন নিয়ে একেকটি কবিতা রচনা করে গেছেন। যখন যে ভাবনাটি মনে এসেছে তাকেই কাব্যিক রূপ দান করেছেন।

কবি বার্ধক্যের দিনগুলি কাটিয়েছেন নিতান্তই স্মৃতিকে সম্বল করে। প্রথম যৌবনে তিনি কিছুদিন চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান বাড়িতে কতকগুলি উজ্জ্বল দিন অতিবাহিত করেছিলেন। সেই দিনগুলির মধুর স্মৃতি তাঁকে কাব্য পথ-পরিক্রমায় বিশেষ প্রেরণা দিয়েছিল। আবার ১৩৪২ সনের কিছু আগেও বেশ কিছুদিন তিনি সেই চন্দননগরের বাগানবাড়িতে কাটান। অতীতের সেই দিনগুলিতে তিনি জ্যোতিদাদা এবং তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীকে কাছে পেয়েছিলেন, কিন্তু এই বার্ধক্যে তাঁরা নিতান্তই স্মৃতি। 'বীথিকা'র বেশ কিছু কবিতায় এই বিশেষ ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা চলে 'বীথিকা' স্মরণমূলক। তাই এই কাব্য রচনাকালে সাধারণ খুঁটিনাটি বিষয়কে নিয়ে কবি ভাবছেন, তারই মাঝে প্রেমের কথাও এসেছে। কিন্তু

প্রত্যেকটি ভাবনাতেই কবির দার্শনিক মনটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। 'বীথিকা'য় কাহিনীমূলক কবিতা মাত্র একটি — সেটি 'মিলনযাত্রা'। একটি মৃত্যু দৃশ্যের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে কবিতাটি শুরু হলেও প্রসঙ্গক্রমে কাহিনীতে গৃহিণীর পুত্র-পুত্রবধূকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে প্রেমের তথা মিলনের গল্প। তবে কাহিনীতে সামগ্রিকভাবে কবির যে দার্শনিক ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তা কবিতার নামকরণ 'মিলনযাত্রা' শব্দটির মধ্যেই প্রোথিত। কবি বলতে চেয়েছেন কাহিনীর গৃহিণী জয়লক্ষ্মী জীবনের শেষযাত্রায় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মিলিত হয়েছেন ঈশ্বরের সঙ্গে আর তার পুত্র ও পুত্রবধূরও শুরু হল নবজীবনের উদ্দেশ্যে মিলনযাত্রা।

পূর্ববর্তী 'শেষসপ্তক' কাব্যে লক্ষ্য করা গেছে যে কবি আপন সত্তার রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন; 'পত্রপুট' কাব্যেও সেই ভাবনার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এ সময় কবি ব্যক্তিগত জীবনের আপন সত্তার গভীরে প্রবেশ করে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসাকে একবার পেছনের দিকে তাকিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। আবার মানব সংসারের সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী কথাও তিনি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কবি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন যে মানুষের সুখ-দুঃখের মধ্যে বিশ্বাত্মার ভূমিকা কতোখানি, ব্যক্তিপ্রাণের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণের যোগই বা কোথায়, কতটুকু। তবে কবিজীবনের শেষপর্বের সব কাব্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে কবির যে মৃত্যুচেতনার প্রকাশ, 'পত্রপুট' কাব্যও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই পৃথিবীতে প্রকৃতির মনোহারী নয়নমুগ্ধ করা রূপ দেখেও মৃত্যুভাবনায় ভাবিত হয়েছেন কবি। কবির বিচিত্র অনুভূতি তাই এই কাব্যের প্রায় প্রতিটি কবিতায় বাঙ্ময় রূপলাভ করার পাশাপাশি বিদায়-দিনের বিষণ্ণতাও এর মধ্যে করুণ সুরে বেজেছে। 'পত্রপুট'-এর সব কবিতাতেই রয়েছে কবির মনের বিচ্ছিন্ন ভাবের প্রকাশ। তাই এক্ষেত্রে আখ্যানভিত্তিক কোনো কবিতা স্বভাবতই সৃষ্টি হয়নি।

১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্রের মধ্যে রচিত কবিতাগুলি 'শ্যামলী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের প্রকৃতির শ্যামল স্নিগ্ধ শোভায় কবি ছিলেন মুগ্ধ। তাই তিনি বঙ্গদেশের মেয়ের চোখে দেখেছেন মাটির শ্যামল অঞ্জন, কচি ধানের চিকন আভা, মনে প্রকৃতির স্নিগ্ধতার মতোই স্নিগ্ধ প্রেম। আর তাকেই রূপ দিয়েছেন 'শ্যামলী' কাব্যের কবিতাগুলিতে। কিছু কবিতায় বর্তমানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও হৃদয়ের পুরোনো স্মৃতিকে মথিত করে কবি আপন ভাবনাকে বাণীরূপ দিয়েছেন। তবে সেগুলিতে কাহিনী গড়ে ওঠেনি। কবির যে বিশেষ একটি ভাবনার প্রকাশ এ সময়ে রচিত কাহিনীকবিতাগুলিতে লক্ষ্য করা যায় তা হল — তুচ্ছতার মধ্যেও গৌরব আরোপের প্রচেষ্টা ও মানবসত্তার স্বরূপ সম্পর্কে নির্বিড় উপলব্ধি। তাই এখানকার যে কবিতাগুলিতে কাহিনীর আবেশ রয়েছে সেখানে জমকালো কোনো গল্প নেই, চমক নেই, আবেগও 'পুনশ্চ'র তুলনায় কম। তবে এখানে নতুন ভাবনা প্রকাশক কবিতা তেমন গড়ে না উঠলেও নায়ক-নায়িকার বিরহাতুর চিত্তের প্রকাশ অধিকাংশ কাহিনীমূলক কবিতায় প্রেমের কাহিনী গড়ে উঠতে সহায়ক হয়েছে। তবে সেই প্রেমের মধ্যেও বিরহের ছোঁওয়াটি স্পষ্ট অনুরণিত। প্রেমের কবিতাগুলির নায়িকারা বাংলাদেশের শ্যাম-স্নিগ্ধ বাঙালী মেয়ে। 'শ্যামল' শব্দটির প্রতি আশ্চর্যরকমের প্রীতি লক্ষ্য করা যায় এসময়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শান্তিনিকেতনে

বসবাসের জন্য এই সময়কালে একটি মাটির ঘর নির্মিত হয়, কবি তার নামকরণ করেন 'শ্যামলী'। 'শেষ সপ্তক'-এর ৪৪ সংখ্যক কবিতায় তিনি একথার স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন। 'শ্যামলী' কাব্যটি প্রকাশ পেয়েছিল সেই মাটির ঘরের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের পর (ভাদ্র, ১৯৪৩ প্রকাশ)। 'শ্যামলী'র 'কন্যা', 'হঠাৎ দেখা', 'দুর্বোধ', 'অমৃত', 'বঞ্চিত' ইত্যাদি আখ্যানকবিতায় এবং 'শেষ পহরে', 'সম্ভাষণ', 'অকালঘুম' ইত্যাদি গল্পিকাগুলিতে আলোচ্য কবিমানসের পরিচয়টি সুব্যক্ত।

রবীন্দ্রনাথের কবিমনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি গম্ভীর ও দুরূহ কোনো বিষয় নিয়ে ভাবিত হলেও তার পাশাপাশি অবকাশ পেলেই রঙ্গরসিকতা ও লঘু হাস্যপরিহাসের চপলতায় মনকে মেলে ধরতে জানতেন। তাই 'শ্যামলী'র পাশাপাশি রচিত হল 'খাপছাড়া', 'ছড়ারছবি'র মতো কাব্য। যা একান্ত অসম্ভব অনুচিত বা অবাস্তব, অসংলগ্ন সেই সব ভাবনা ও কথাই টুকরো টুকরো ভাবে স্থান পেয়েছে এই দুটি কাব্যে। এই কাব্যদু'টির অন্তর্গত সব ছড়াই আজগুবি কথায় পূর্ণ। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, পরস্পর বিরোধী উক্তি স্বাভাবিকভাবেই শিশুমনে জাগিয়ে তোলে হাস্যরস। শুধু শিশু কেন, এ হাস্যরসে অভিভাবকবর্গও না হেসে পারেন না। 'খাপছাড়া'র এমনই একটি ছড়ায় 'খাস্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির' কালনা-নিবাসিনী পাঁচবোনের নিতান্ত অসংগত কার্যকলাপ গল্পের আকারে বর্ণিত হয়েছে।

কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জানলায়।
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে
চুন দেয় তারা তামাকে।

তবে 'খাপছাড়া'য় কোথাও কোথাও এমনকিছু বর্ণনা রয়েছে যার রস পরিণত মনের মানুষই একমাত্র গ্রহণ করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে কবির পরিণত মনটির রেখাপাত ঘটেছে।

ধীরু কহে শূন্যেতে মজো রে,
নিরাধার সত্যেরে ভজো রে।
.....
কিছুতে কিছু না-পানে পৌঁছে না ঘোড়াটা,
চাবুক লাগায় তারে সজোরে।

তবে বেশিরভাগ ছড়াতেই কবির শিশু মনটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। ছেলেবেলায় যে ছড়াজগৎ কবিগুরুর শিশুমনে একটা অনির্বচনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল, বার্ধক্যে তা-ই আবার কবির মনকে অনাবিল আনন্দে ভাসালো। এরই ফসল 'খাপছাড়া' ও 'ছড়ারছবি'।

'ছড়ার ছবি'র ছড়াগুলি ছোটোদের মনের উপযোগী করেই লেখা। তবে বড়োদেরও আনন্দ দেয় ছড়াগুলি। ছড়া লেখাই কবির উদ্দেশ্য ছিল, তবে কাব্যের আশ্রয়ে ছড়ার ছবি'তে গল্পরস জমে উঠেছে, যেগুলিতে কাহিনী রয়েছে। বার্ধক্যে পৌঁছে কবিমানস যে বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতির অনুধ্যানে বিভোর ছিল তারও পরিচয় মেলে 'ছড়ার ছবি'র বেশ কিছু কবিতায়। জীবনসন্ধ্যায় যে ঔদাসিন্য কবির মনকে ব্যথিত করে তারই আভাস রয়েছে এই কাব্যের 'পিস্‌নি' কবিতায়—

গ্রাম-সুবাদে কোন্‌কালে সে ছিল যে কার মাসি,
মনিলালের হয় দিদিমা, চুনিলালের মামি,
বলতে বলতে হঠাৎ সে যায় থামি,
স্মরণে কার নাম যে নাহি মেলে!
গভীর নিশ্বাস ফেলে
চুপটি করে ভাবে
এমন ক'রে আর কতদিন যাবে।

এই কবিতায় নিঃসঙ্গ বৈতরণীগামিনী পিস্‌নি বুড়ির করুণ আলেখ্য বর্ণিত। 'কাঠের সিঙ্গি', 'আতার বিচি', 'বালক' প্রভৃতি কবিতায়ও এভাবেই এসেছে কাহিনী।

হঠাৎ ১৩৪৪ সালের ভাদ্র মাসে কবি কঠিন রোগাক্রান্ত হলেন, সেই নিশ্চেতন অবস্থার নূতন অভিজ্ঞতা কবির কাব্যের জগতে ঘটালো পালাবদল। অজ্ঞান ও অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে কবির যে অন্ধকার আঁধারি অনুভব, সজ্ঞান হয়ে সেই চেতনাকেই তিনি রূপ দিলেন কতকগুলি কবিতায়—সেগুলির সংকলন গ্রন্থ 'প্রান্তিক'। 'প্রান্তিক'-এর কবিতাগুচ্ছের বিষয়বস্তু মৃত্যুসম্পর্কিত। মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি নয়, তা জীবনেরই অংশ, পূর্ণতার ঘোষণা। মৃত্যুদ্বারা আত্মা মুক্ত হয়, জীবনের গ্লানি, ক্লেদ ধুয়ে মুছে যায়। এই অনুভবেরই কবিকৃত রূপায়ণ লক্ষ্য করা গেল 'প্রান্তিক'-এ। পরিণত বয়সে তাঁর দার্শনিকসত্তা ও কবিসত্তার যেন একত্রে মিলন হয়েছে এই কাব্যে। আর সেকারণেই কবি এই দার্শনিক উপলব্ধিকে কবিতায় সরাসরি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, এর জন্য কাহিনী বর্ণনার প্রয়োজন হয়নি।

'প্রান্তিক'-এর পরবর্তীকালেই রচিত 'সেঁজুতি'। এই কাব্যে বিধৃত কবিতাগুলিতেও রয়েছে দিনাবসানের ইঙ্গিত। আবার এই কাব্যের কিছু কবিতায় একদিকে যেমন কবি অতীত জীবনের হিসাব নিকাশ করার স্বল্প চেষ্টা করেছেন তেমনি জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আধ্যাত্মিক সত্তা সম্পর্কেও সচেতন হয়েছেন। এখানেও কাহিনী মূলক কবিতার অস্তিত্ব নেই। কারণ মনের এই অবস্থায় উপলব্ধিটাই বড় আসন পেয়েছে, কাহিনী রচনার মতো মননশীলতা তখন নেই।

রবীন্দ্র প্রতিভার বিশদ পরিচয় যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কবি সাহিত্যসৃষ্টির

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিপুল বৈচিত্র্যের সম্ভার রেখে গেছেন পাঠকের জন্য। 'প্রান্তিক' ও 'সেঁজুতি' কাব্যদ্বয়ে কবির দার্শনিক প্রজ্ঞাশীল মননশীলতার পরিচয় পাওয়ার পাশাপাশি সমসাময়িক কালে রচিত 'প্রহাসিনী' কাব্যে ধরা পড়ে কবির রঙ্গরসে পূর্ণ মননটি। যখনই তাঁর মন দার্শনিক চিন্তায় স্থির, গম্ভীর তখনই হয়তো বা মনের গুরুভার লঘু করার প্রচেষ্টায় মনের কৌতুকরসকে বিকীর্ণ করলেন 'প্রহাসিনী'তে। তবে এখানে কৌতুকরসটি কোনো পূর্ণাঙ্গ কাহিনী, ছড়া বা গল্পকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি; সেখানে কৌতুকরস মূলত শব্দকে আশ্রয় করেই সৃষ্টি হয়েছে। ব্যঙ্গরস ও হাস্যকৌতুক রসের আমদানি ঘটাতে কবি যে কতো নতুন নতুন শব্দ গড়ে নিয়েছেন তার হিসাব মেলা ভার! কখনো লোভী অর্থে লিখেছেন 'লুভি', অস্তিত্ব অর্থে 'আছিত্ব' আবার মশার বিশেষণ কবির কলমে হয়েছে 'মাশবী'। তবে কবির এই সময় পদ্যে কাহিনী রচনার মনন-প্রবণতা আদৌ ছিল না।

জীবনের শেষভাগে পৌঁছে কবি সুদীর্ঘ জীবন-পথের অতীতের দিনগুলির দিকে আরেকবার ফিরে তাকালেন। দেখলেন কবির প্রিয়জনেরা অনেকেই আজ আর নেই, নিঃসঙ্গ কবির স্মৃতিতে এসে ভিড় করেছে বালক বয়সের স্কুল পালানোর কথা, মলিন হয়ে যাওয়া রামায়ণ-মহাভারত পাঠের কথা। ঘাট বাঁধানো পুকুর, পুকুরে স্নানের স্মৃতি, কৈশোরের প্রথম প্রেমের স্মৃতি, বালা জীবনের নতুন প্রেমের আবেগ, শিহরণ ও বেদনার কথাও স্থান পেয়েছে এই স্মৃতিচারণায়। তাই স্মৃতিচারণার টুকরো টুকরো ভাবনা, কথা ও চিত্রের দ্বারাই সৃষ্টি হল কিছু গল্পাভাসযুক্ত কবিতা। 'স্কুল পালানো', 'কাঁচা আম', 'যাত্রা', 'ময়ূরের দৃষ্টি' ইত্যাদি কবিতাগুলিতে রয়েছে একেকটি বিষয় ও ঘটনাকে অবলম্বন করে গল্পাভাস. স্কুলের ক্লাস পালিয়ে নির্জন বাগানে ছুটে চলে যাবার আনন্দ রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় 'স্কুল পালানো' কবিতাটি। বাগানে বহু পুরোনো আমড়া গাছ; কবি আমড়া ফলের প্রত্যাশী ছিলেন না, শুধু সেখানে হেলান দিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন — অনুভব করতেন প্রকৃতির মধুর স্পর্শ। এভাবেই স্মৃতির মালা গাঁথতে গিয়েই কবির অজান্তে সৃষ্টি হয়েছে গল্পরসে সমৃদ্ধ কিছু কবিতা।

কবির মন-ঋতু যে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং তার ফলেই যে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ নব সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়েছে, একথা আর নতুন করে উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখেনা। 'নবজাতক' এই রকমই এক পরিবর্তিত ঋতুর ফসল। এই গ্রন্থে ১৩৩৯ সাল থেকে ১৩৪৭ সালে লেখা বিচিত্র ভাবনাবিষয়ক কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। সেই সব বিচিত্র মনোভাবের আলোচনা পূর্বে আলোচিত সেই সময়কালের কাব্য প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই কাব্যটি সৃষ্টির সময় নতুন কিছু কবিতাও কবি লেখেন। সেগুলিতে নতুন এক ভাবনা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। তৎকালীন সভ্যতার মানবতা বিরোধী ধ্বংসকারী যে রূপ তিনি দেখেছেন, যান্ত্রিক সভ্যতার স্ফীত হয়ে ওঠা মানুষের দ্বারা যেভাবে সর্বহারা মানুষের দল শোষিত হচ্ছে তা দেখে তিনি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ফলে তিনি মানুষকে শোনালেন আশ্বাসের বাণী আগামী দিনের নবজাতক শোষিত বঞ্চিত মানুষের

সংকট মোচন করবে। এই ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু কবিতা। তাই যথার্থ কোনো কাহিনীকবিতা 'নবজাতক'-এ নেই।

১৩৩৯ সাল থেকে ১৩৪৭ সালের মধ্যে লেখা কিছু কবিতা 'নবজাতক'-এ ছাপা হল। আর কিছু ছাপা হল 'সানাই'তে। তবে এটি প্রকাশের পূর্বে এই সময়েও এর সঙ্গে নতুন কিছু কবিতা ও গান কবি লিখে দিলেন, সেগুলিও 'সানাই' কাব্যে স্থান পেল। কবির জীবন-গোধূলিতে যে মানসের পরিচয় পাওয়া যায় — আপন জীবনসত্তার পরিচয় লাভের জন্য প্রয়াস — এখানে কিন্তু তাঁর কবিকল্পনা সেই দার্শনিক মনের আবেশ থেকে মুক্ত হয়ে ভিন্ন প্রদেশে যাত্রা করেছে। 'সানাই'-এর কবিতাগুলি প্রেমের আবেগে জড়িত। আগেকার কাব্যগুলির মতোই সহজ সরল কথায় কবি ব্যক্তিজীবনের প্রেম ও স্মৃতি ব্যক্ত করেছেন এ কাব্যে। বার্ধক্যে পৌঁছে এই মর্ত্যলোকের স্নেহ-সোহাগ-প্রেমে আবিষ্ট অতীতের ফেলে আসা দিনগুলির প্রতি ধাবিত হয়েছে কবির মন। তবে কবি জানেন যে পৃথিবী থেকে তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হবে। তাই এই সময়ে রচিত প্রেমের কবিতাগুলিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একপ্রকার উদাসীন করুণ বেদনার স্পর্শ রয়েছে।

'সানাই'-এ বেশিরভাগই প্রেমের কবিতা রয়েছে, তবে সবগুলিতে কাহিনীর অস্তিত্ব নেই। এখানকার 'পরিচয়' ও 'বাসাবদল'-এই দুটি আখ্যানমূলক কবিতা। কিন্তু গল্পরসের চেয়ে কবির উপলব্ধিজাত সত্যই এগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে বেশিমাত্রায়। তাই সার্বিকভাবে বলা চলে 'সানাই'-এ কবিমানস অতীতমুখী।

'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য' গ্রন্থদ্বয়ে কবির একই মননের পরিচয় বিধৃত। ১৯৪০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কবি কালিম্পঙ-এর গৌরীপুর ভবনে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এরপর থেকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি কলকাতায় দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। শারীরিক এই পরিস্থিতিতে কবি-মানস জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো মর্ত্যের সৌন্দর্য ও ভালোবাসার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে সংহত, সংক্ষিপ্ত, নিরাভরণ অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যঞ্জনাগর্ভ কথা। কবিতায় কাহিনী বা গল্প পরিবেশন আর তাই সম্ভব হল না। কারণ কাহিনী বা গল্পবর্ণনার জন্য যে অতিভাষণ বা 'দীর্ঘবিবৃতি' প্রয়োজন তা ভগ্ন দেহে ও মনে কবির পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। তাছাড়া এসময় অসুস্থ কবি নিজে হাতেও কবিতাগুলি লেখেননি; মুখে মুখে বলেছেন আর শুশ্রূষাকারীরা লিখে গেছেন। অথচ এ অবস্থা কবির আদৌ পছন্দসই নয়, এবার কথাও নয়। এই অবাঞ্ছিত অনভ্যস্ত পরিস্থিতি কাহিনীকাব্য রচনার পক্ষে একেবারেই অনুকূল ছিল না।

'আরোগ্য' কাব্যের কবিতাগুলি রচনাকালে কবি বেশ সুস্থ। তাই পৃথিবীর রূপ রস-গন্ধ স্পর্শে মানুষের প্রীতি-ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়েছেন শেষবারের মতো। আবার এইগুলি উপভোগ করতে পারছেন বলে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি জানেন মর্ত্যলোক থেকে চলে যাবার সময় আসন্ন। তাই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে চলে যাবার মানসিক প্রস্তুতির কথাও। এই ভাবনারই প্রকাশ রয়েছে 'আরোগ্য' কাব্যের কবিতায়। কবিতাগুলিতে কোথাও কোথাও অতীতের সুমধুর প্রকৃতির স্মৃতিও ঠাঁই করে নিয়েছে। এর ফলে কবিতার মাধ্যমে একেকটি

চিত্র পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। তবে চিত্রগুলি প্রকৃতিবিষয়ক ও অসংলগ্ন। তাই এ সময়ও গল্প বা কাহিনীর সৃষ্টি হয়নি।

'জন্মদিনে' কাব্যটিতে স্বাভাবিকভাবেই কবির শেষবেলার মননশীলতার গভীর ছাপ রয়েছে। নিজের জন্মদিন উপলক্ষে কবির বিবিধ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যে। নিজের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে কবির মনে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে, বিশ্বসৃষ্টির রহস্যে নিজের অন্তরতম সত্তার স্থান কোথায়, সারাজীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির, আশা-নৈরাশ্যের মূল্যায়ন, লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাওয়ার অনুভূতি — এসব বিচিত্র ভাবনাজাত সৃষ্টি হল 'জন্মদিনে'। তবে মানুষ ও পৃথিবীকেও যে তিনি কতোটা ভালোবেসেছেন তাও ব্যক্ত হয়েছে এখানে। কিন্তু কবিতায় কাহিনী বা গল্প সৃষ্টি হয় নি। কারণ কবির মনের যে প্রকৃতি কাহিনী রচনার সহায়ক ছিল, তা জীবনের এই শেষ দিনগুলিতে আর কবির মধ্যে ছিল না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'জন্মদিনে' কবির মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ।

কবির তিরোধানের পর প্রকাশ পেল 'ছড়া', 'শেষলেখা', 'স্ফুলিঙ্গ', 'বৈকালী' ও 'চিত্রবিচিত্র'। এগুলির মধ্যে 'ছড়া'য় যে সব আজগুবি রসের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় তাতে গল্প রচনা হতে পারতো। কিন্তু এলোমেলো চিন্তার সমাবেশের ফলে এখানে কোনো গল্পাভাস নেই। তাই কাহিনীকবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে কবির মননের পরিচয় দানের ক্ষেত্রে এই কাব্যগুলিকে সম্ভবত আলোচনার প্রয়োজন হয় না।

মনের বিচিত্র খেয়ালে কবি তাঁর সমগ্র জীবনে একের পর এক বিচিত্র স্বাদের কাব্য ও কবিতা রচনা করে গেছেন। কাহিনীমূলক কবিতা তারই অন্যতম। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট রূপে অনুমান করা চলে যে, কবিগুরুর বিচিত্র মন ও ভাব অনুভবের ফসল হল কাহিনী ধর্মী কবিতা, আখ্যান কাব্য, গল্পবীজ ভিত্তিক কবিতা ও গল্পাভাস বিশিষ্ট কবিতাবলী।